আমরা বেশ আছি

জীবনানন্দ দাশ

ভূমিকা ও সম্পাদনা

গৌতম মিত্র

ভূমিকা

যদি আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখি, জীবনানন্দ দাশ তাঁর পঞ্চান্ন বছরের জীবনে উপন্যাস লিখেছেন মাত্র পাঁচ বছর। হিসেবটা এই রকম:

১৯২৬-এ লিখেছেন জ্যোতি

১৯৩০-এ লিখেছেন বিভা

১৯৩২-এ লিখেছেন কল্যাণী, আমরা বেশ আছি, জীবনযাপন, চৌত্রিশ বছর, নভেলের পাণ্ডুলিপি, কলকাতা ছাড়ছি ও অতসী।

১৯৩৩-এ লিখেছেন আমরা চারজন, মৃণাল, কারুবাসনা, জীবন প্রণালী, বিরাজ ও প্রেতিনীর রূপকথা।

১৯৪৮ -এ লিখছেন মাল্যবান, সুতীর্থ, বাসমতির উপাখ্যান ও জলপাইহাটি।

এর বাইরে রইল পূর্ণিমা ও নিরুপম যাত্রা নামে দুটি লেখা। যদিও অনেকে এই দুটো লেখাকে উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেন, এগুলো কিন্তু পাণ্ডুলিপি খাতার সাক্ষ্য হিসেবে বড়ো গল্প হিসেবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় এই লেখা দুটিকে ''নভেলা'' নামে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ জীবনানন্দ দাশের এই ১৯ টি উপন্যাস পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা হয়েছে।

পাঁচ বছরের মধ্যে আবার দুই বছরে, ১৯২৬ ও ১৯৩১-এ লিখেছেন মাত্র একটি করে উপন্যাস। বেশি লিখেছেন ১৯৩২-এ ৭ টি উপন্যাস, তারপর ১৯৩৩-এ ৬ টি ও ১৯৪৮-এ ৪ টি। এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, জীবনানন্দ দাশ সারাজীবনে উপন্যাস দ্বারা গ্রস্ত হয়েছিলেন মাত্র তিন বছর।

একটি জিনিস লক্ষ্য করার মতো, যখন তিনি চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব ও মানসিক অস্থিরতায় ভুগছেন তখন তিনি গদ্যের কাছে আশ্রয় নিচ্ছেন। ভূমেন্দ্র গুহর মনে হয়েছিল, আরও অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির মতো জীবনানন্দ দাশেরও বাইপোলার ডিসঅর্ডার ছিল। আমার তেমনটি মনে না হলেও, একটা ঘোরের

মধ্যে যে উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

'চারি দিকে ছায়া জমে গেছে: বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার— নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি আরম্ভ হল। নরম সোঁদা গন্ধ ভেসে আসে, বেশ ভালো লাগে আমার এই বৃষ্টি খড়ের উপর ছম ছম শব্দ হয়, ধুলো-মাটির। কেমন একটু শীত শীত করে, সুগন্ধি কদমের মত দেহ কাঁটা দিয়ে ওঠে—শিহরিত হয়ে ওঠে অবচেতন। চার দিকে তাকিয়ে দেখি শুধু মৌসুমির কাজল-ঢালা ছায়া— কিশোর বেলায় যে কালো মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম— কোন এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই আঙ্গিনার নিকটবর্তিনী ছিল-বহুদিন যাকে হারিয়েছি— আজ সে-ই যেন পূর্ণ যৌবনে উত্তর আকাশে দিগঙ্গনা সেজে এসেছে- দক্ষিণ আকাশে সে-ই যেন দিকবালিকা- পশ্চিম আকাশেও সেই বিগত জীবনের কৃষ্ণা মমি-পুব আকাশ ঘিরে তারই নিটোল কালো মুখ, নক্ষত্র-মাখা রাত্রির কালো দিঘির জলে চিতল-হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার, প্রিয় পরিত্যক্ত মৌন-মুখি চমরীর মতো অপরূপ রূপ। ক্লান্ত অশ্রু-মাখা চোখ, নগ্ন শীতল নিরাভরণ দু''খানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা, পৃথিবীর নবীন জীবন ও নরলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনায় সেই পুরানো পল্লির দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশে তার যাত্রা—

সেই বনলতা— আমাদেরই পাশের বাড়িতে থাকত সে— কুড়ি-বাইশ বছরের আগের সে এক পৃথিবীতে; বাবা তার লম্বা চওড়া ঋজু গড়নের মানুষ- সাদা দাড়ি-রিও মুসলমান ফকিরের মতো দেখতে। বহুদিন হয় তিনিও এ পৃথিবীতে নেই আর; কত শীতের ভোরে কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আর; বছর পনেরো আগে দেখেছি, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলছে, মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য, লেবু-ফুল ফোটে, ঝরে যায়। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ উদ্দেশ্যহীন কলরব করে আরও গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে— খানিকটা খড় ও ধুলো ছড়িয়ে যায় উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর হতে মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই, বনধুধুল, মাকাল, বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে।

বছর আষ্টেক আগে বনলতা এক বার এসেছিল— দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেক ক্ষণ কথা বললে সে-তার পর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল— কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নত মুখে মাঝপথে গেল থেমে তার পর খিড়কির পুকুরের কিনার দিয়ে,

শামুক গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে- নিবিড় জামরুল গাছটার নিচে এক বার দাঁড়াল তার পর পোষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।'

(কারুবাসনা, ১৯৩২)

'মাল্যবান একটা চুরুট জ্বালিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঢং ক'রে একটা শব্দ হল, পাশের বাড়ির ঘড়িতে সাড়ে-এগারোটা। এই বারে হয়তো ছেলেটি নেমে চ'লে যাবে। কিন্তু কৈ, নামল না তো সে। মাল্যবান ভাবল, গান-বাজনা আবার শুরু হবে হয়তো। কিন্তু তা-ও তো হল না। যত ক্ষণ গান সরোদ হাসি তামাশা চলছিল অন্ধকারে ঢিল মেরে নিজেকে তবুও খানিকটা ব্যস্ত রাখা চলে। কিন্তু সব থেমে গেছে তো এখন-বেশি রাত বেশি অন্ধকার বেশি শীত: এখন কী? কী হচ্ছে এখন? যা হচ্ছে, তা হচ্ছে: মনের হেঁয়ালির কাছে মার খেয়ে কোনও লাভ নেই। মনটাকে সে খুব হালকা ক'রে নিল; যেন খুব মজা-ই হয়েছে ওপরের ঘরে, মনে ক'রে হাসতে লাগল সে; সাইকেলটাকে মনে হল অমরেশের নেপালি বয়ের মতো, সাইকেলের ঝিকমিকানিটাকে ভোজালির ঝলসানির মতো; কোমরে ভোজালি গুঁজে অমরেশের নেপালি চাকরটা যেন বেশি রাতের নিরেট শীতে পুপি বুড়ির মতো ব'সে আছে, মনিব ওপরের থেকে না নামলে রক্ষা নেই তার, কিছু নেই; কিন্তু, তবুও, একটা আশ্চর্য প্রতীকের মতো যেন এই নেপালি, এই বোকা নেপালি ভোজালি- আজকের পৃথিবীর। স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক, মানুষে-মানুষে সম্পর্ক, মানুষের ও প্রকৃতির সম্বন্ধ, সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে- সফলতাও সরলতাও; হারিয়ে ফেলেছে সরসতা; আজকের বিমূঢ় পৃথিবীতে সমস্ত পরিচ্ছন্ন সম্পর্ক-গ্রন্থিকে ছেদ ক'রে অপরিমিত গণ্ডমূর্খের অপরিমেয় মনোবল পথ কেটে চলেছে একটা বোকা নেপালি ভোজালির মতো। সময়কে প্রকৃতিকে পুরাণপুরুষকে (যদি থাকে কেউ) তবে কী হিসেবে ধ্যান করা যাবে আজ? প্রভু হিসেবে? সখা হিসেবে? পত্নী হিসেবে? না, তা নয়, স্বামী স্ত্রী বা সখা ভাবে নয়, সাধা হবে নেপালি ভোজালি ভাবে; ঘুম আসছে না মাল্যবানের।'

(মাল্যবান, ১৯৪৮)

এই ঘোর ''আমরা বেশ আছি'' উপন্যাসের পরতে পরতে। সারাজীবন ধরে আত্মজীবনীই তো লেখেন একজন লেখক। যাকে জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, ''diversified autobiography''। তবে এই আত্মজীবনী কোনও সরলরেখায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, বক্ররেখায় সম্ভব নয়, বৃত্তে তো নয়ই। বরং রেখাগুলো টুকরো করে বিন্দুবৎ ছড়িয়ে দিতে হবে। আর তার পর আলাদাভাবে প্রতিটি বিন্দুর

কম্পন, চলন ও নিশ্চেতনা খাতায় টুকে রাখা। রোলাঁ বার্থ তাঁর আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে প্রচলিত প্রথা না মেনে আত্ম-জীবনীকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে থিম অনুসারে সারা বইয়ে বিস্তার দেন। দেরিদা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মোটিফ অনুসারে তা ছড়িয়ে দেন। এই ‘‘মোটিফ’’ ও ’’থিম’’-এর খোঁজ করতে হবে জীবনানন্দের উপন্যাস পাঠে।

কী গল্প ‘‘আমরা বেশ আছি’’ উপন্যাসের? যদিও প্লটে বিশ্বাস করতেন না জীবনানন্দ। লেখক চান বা না চান তার লেখার চরিত্ররা লেখকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না বলেই বিশ্বাস করতেন। তবু একটা আবছা প্লট আছে এই উপন্যাসের। সত্যেন, সত্যেনের প্রেমিকা শেফালি ও স্ত্রী মাধবীর গল্প। মাধবী এই উপন্যাসে অনুপস্থিত হয়েও ভীষণভাবে উপস্থিত। সত্যেন বেকার একজন যুবক। চাকরির আশায় কলকাতার একটি বোর্ডিঙে মাথা গুঁজে পড়ে আছে। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী দেশের বাড়িতে মলিনভাবে দিন অতিবাহিত করছে। চার-পাঁচ বছর আগের প্রেমিকা শেফালি এখন আর ততটা প্রেমিকা নয়। কিন্তু ‘‘প্রেম বড়ো কঠিন দেবতা’’! এর হাত থেকে সত্যেনের নিস্তারও নেই। সে নানান অছিলায় শেফালির সঙ্গ যাচনা করে। যে হাতটা সত্যেন শেফালির দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল তা অমন করে শেফালি ফুরিয়ে দিলেও দেহমনে তার শেফালিই বিরাজ করে।

আসলে এটি একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প হতে পারত, থাকতে পারত তা নিয়ে টানাপোড়েন। কিন্তু জীবনানন্দ চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কোনও গন্তব্যে পৌঁছাতে চান না। আসলে জীবন কোথাও পৌঁছায় না, শুধু পথে পথে তার চিহ্ন রেখে যায়। লেখকের কাজ সেই চিহ্নকে মূর্ত করে তোলা। যাপন আমাদের নানারকম বোধে পৌঁছে দেয়, যেমন সত্যেনের মনে হয়:

‘এর সঙ্গে এ-রকম লুকোচুরি জীবনে খুব কম খেলেছে সত্যেন; কিন্তু, আজ, খুব স্পষ্টাস্পষ্টি খেলল; খেলে এমন একটা কিছু বেদনাবোধ হল না তার; আগের মতন এমন একটা কিছু বেদনাবোধ, বা অস্বাভাবিক বাধা, অনুভব করলে না সে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, সত্যেন বড়ো হয়েছে- অভিজ্ঞ হয়েছে- বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক হয়েছে; সে শিখেছে যে, যে-জীবন অম্লান-বদনে অনেককেই অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত করছে, সেই জীবনকেই লোকে আবার জীবনদেবতা ব’’লে পুজো করে। কাজেই, প্রতারণা দেবতারও ধর্ম প্রতারণায় দেবতার কোনও সঙ্কোচ নেই; সত্যেনেরই-বা থাকতে যাবে কেন? অবিশ্যি, খুঁটিনাটি নিরপরাধ জিনিস নিয়েই প্রতারণা করে সে; যেখানে প্রতারণার গ্লানি ব্যথা অত্যাচার, সেখান থেকে তার প্রবৃত্তি শিহরিত হয়ে ফিরে আসে। হয়তো এটুকু তার দুর্বলতা।

জীবনের এই পরিষ্কার স্টাডি শেফালির, বা মাধুরীর, এখনও সাধ্যায়ত্ত হয় নি। কে জানে, কোনও দিন হবে কী-না! হয়তো কোনও দিন হবে না। কিন্তু, হলেও, তাদের হাতে এমনই প্রতারিত হতে সত্যেনও খুব রাজি আছে।'

(আমরা বেশ আছি, ১৯৩২)

কীভাবে জীবনানন্দ নিজের জীবনকে টুকরো টুকরো করে বিভিন্ন লেখায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, diversified autobiography করে তুলেছেন, তাঁর ডায়েরি ও জীবনের সাক্ষ্য আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়। ১৯২৯-এর শীতে জীবনানন্দ দাশ চাকরি ও ব্যবসার সন্ধানে ডিব্রুগড়ে কাকা অতুলানন্দ দাসের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। অতুলানন্দ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের অফিসার। তিন-চার মাসের এই বসবাস কালে তিরিশ বছরের জীবনানন্দ অতুলানন্দ কন্যা ক্লাস নাইনের ছাত্রী পনেরো বছরের শোভনার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এবং ডায়েরির সূত্রে জানতে পারি তা শারীরিকও ছিল।

এই উপন্যাস যখন লেখা হচ্ছে শোভনা তখন কলকাতায় ডায়োসেসান কলেজের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে, স্ত্রী লাবণ্যকে দেশের বাড়িতে রেখে জীবনানন্দও তখন একা কলকাতার বের্ডিঙে। ডায়েরি সূত্রে জানতে পারি, উপন্যাসে যেমন সত্যেন শেফালির সঙ্গে দেখা করতে দারোয়ানকে দিয়ে স্লিপ পাঠাচ্ছেন, বাস্তবে জীবনানন্দও শোভনার সঙ্গে দেখা করার জন্য দারোয়ানকে দিয়ে স্লিপ পাঠাচ্ছেন। কী পরিমাণ ক্ষরণ হলে একজন লেখক নিজেকে এভাবে বাজি ধরেন তা আমরা বিশ্বসাহিত্য পাঠ করলেই জানতে পারি। কাফকা সঠিক লিখেছিলেন:

'Don't bend, don't water it down, don't try to make it logical, don't edit your own soul according to the fashion. Rather, follow your most intense obsessions mercilessly. A book must be the axe for the frozen sea within us.'

উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে আপাত অমীমাংসিত এক বৃহৎ মীমাংসা দিয়ে। প্রেমিকা ও স্ত্রীর মধ্যকার আততির এক আশ্চর্য শুশ্রূষা খুঁজে পায় সত্যেন:

'শেষরাতে স্থির ঘুমের ভিতর সত্যেনের মনে হল সেই তেতলার ড্রয়িংরুমে শেফালির খোঁপা নিয়ে খেলছে সে, গালে ঠোঁটে নাকে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার, শেফালির সাহস দেখে অবাক হয়ে বলছে, "এই ঘরে সারারাত একা কী ক'রে থাকো তুমি?" তার পর সেই সমবেদনার মুহূর্ত এল— ভালোবাসার চেয়েও গাঢ় যেন সেই বেদনা— সমবেদনা— দুই জন দুই জনকে ধ'রে অনন্তকাল ব'সে রইল কামনাহীন কামনালোকে, বাসনাময় বাসনালোকে। একটা কবরের ভিতর পাশাপাশি

তারা শুয়ে রইল দুই জন অক্ষয় কালের জন্য, পৃথিবীর সমস্ত চিন্তা কথা কাজ চেষ্টা প্রয়োজন ও নিয়মের থেকে ঢের দূরে স’রে—

জেগে উঠে সত্যেনের মনে হল, ও-রকম হবে এক দিন— হবেই— শেফালিকে নিয়ে— হয়তো মাধুরীকে নিয়ে— দু’ জনকে নিয়েই— অনেককে নিয়ে— অনেক প্রিয় বস্তু নিয়ে—কবরের ভিতর নয়—অনেকগুলো নক্ষত্রের মধ্যে।’

(আমরা বেশ আছি, ১৯৩২)

জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস আমাদের অন্তর্গত বিপন্নতা ও বিপর্যয় পেরিয়ে এক করুণা ও আশ্রয়ের কথা বলে। উপন্যাসটির নামকরণ স্বয়ং জীবনানন্দ দাশের। আমার মনে হয় যথার্থ এই নাম কারণ শেষ অবধি সত্যেনের মতো আমরা ভালো থাকতে চাই, ভালো থাকি, বেশ আছি। শুধু তাই নয়, এই যে উপন্যাসটির আদিঅন্ত কিছু নেই, প্রায় কিছুই ঘটে না, একটা মুহূর্তই অনন্ত হয়ে যায়, তা এই নামটির মধ্যে ধরা পড়েছে।

নীচে উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে কিছু তথ্য। যদিও আমি জীবনানন্দ দাশের ‘‘চারটি উপন্যাস’’ সম্পাদনার কাজে সহযোগী হিসেবে যুক্ত ছিলাম, এই লেখাটির জন্য ভূমেন্দ্র গুহ ও প্রতিক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে কৃতজ্ঞ।

‘এই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি তিনটি ছাত্রব্যবহার্য এক্সারসাইজ খাতায় বিন্যস্ত। প্রথম দু’টি খাতার ব্র্যান্ড-নাম। সোয়ান এক্সারসাইজ বুক, দু’টিরই পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮০ ক’রে, অর্থাৎ তারা পাঁচ ফর্মার খাতা প্রত্যেকে, রুল-টানা। প্রথম খাতাটির শেষ দু’’টি পাতা সাদা, এবং তার ঠিক আগের পৃষ্ঠাটিতে একটি মাত্র লাইন লেখা। দ্বিতীয় খাতাটির প্রতিটি পৃষ্ঠাই ঠাসা লেখায় ভর্তি। তৃতীয় খাতাটার ব্র্যান্ড। দ্য ইউনিভার্সাল এক্সারসাইজ বুক/ এ.সি. পাল, / হোলসেল অ্যান্ড রিটেল পেপার ডিলার, স্টেশনার, / এক্সারসাইজ বুকস, নোট বুকস অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট / বুকস ম্যানুফ্যাকচারার, / ৩২, সিমলা স্ট্রিট, ক্যালকাটা; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৯৬, অর্থাৎ ছ’ফর্মার খাতা, রুলটানা, শেষের ২৭ পৃষ্ঠা সাদা। জীবনানন্দ’র হাতের লেখায় ছোট-ছোট অক্ষরে, ঠাসা লেখায়, উপন্যাসটা শেষ হয়েছে ২১৫ পৃষ্ঠায়। প্রথম খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায়, মলাট ওল্টালেই, লেখা আছে ‘‘আ নভেল ভল.।/ জীবনানন্দ দাশ/ ক্যালকাটা ১৯৩২ জুলাই’’। দ্বিতীয় খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায়। ‘‘আ নভেল ভল.।। / জীবনানন্দ দাশ/ ক্যালকাটা ১৯৩২ জুলাই’’। তৃতীয় খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায়। ‘‘আ নভেল ভল.।।। / জীবনানন্দ দাশ / ক্যালকাটা জুলাই ১৯৩২’’। এই খাতাটার প্রথম পৃষ্ঠায় এসে আমরা উপন্যাসটার লেখক-নির্দেশিত নামটা পাচ্ছি: ‘‘আমরা বেশ আছি’’।

পাণ্ডুলিপিটাতে কাটাকুটি খুব বেশি নেই; অবশ্য, এক বার পুরো একটা পৃষ্ঠার

লেখা উপর-থেকে-নীচে টেনে-আনা সমান্তরাল তিনটে লাইনে কেটে দেওয়া হয়েছে, এক বার একটা পৃষ্ঠার তিন-চতুর্থাংশ, এ-ছাড়া, দু'-লাইন তিন-লাইন চার-লাইন এক-একটা পৃষ্ঠায় বার পাঁচ-সাতেক, খুচরো কাটাকুটিগুলিকে ধরা হচ্ছে না। তবে, তাঁর সব গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিতেই যে-রকম হয়, দু'টো লাইনের মাঝে কোনও-এক জায়গায়, অথবা কোনও লাইনের শুরুতে অথবা শেষে, একটা এক্স অথবা দু'টো এক্স বসিয়ে দিয়ে, বুঝিয়ে দেওয়া যে, এই ভাবে চিহ্নিত জায়গাগুলিতে "অধিকন্তু" কিছু ম্যাটার ঢুকবে, এবং সে ম্যাটার পরের পৃষ্ঠাগুলির কোথাও-না-কোথাও কোনও-এক ফাঁক-ফোকরে লিখে রাখা আছে, অন্য কোনও খাতায়ও হতে পারে এখানে টেনে এনে মিলিয়ে দিতে হবে, তা এ-উপন্যাসটার বেলায়ও দু'-তিন বার তো নির্ঘাত ঘটেছে।

উপন্যাসটা অন্তত পক্ষে দু'বার সংশোধন করেছেন তিনি, প্রথমে লিখে ফেলার পরে কোনও-না-কোনও সময়ে, এক বার পরীক্ষার খাতা দেখার মোটা সিসের লাল পেনসিলে, আর-এক বার একটু বেশি গাঢ় কালিতে, অথবা কালিটা তাঁর কলমের একই ব্র্যান্ডের ছিল, নিকটতর কোনও সময়ে ব্যবহৃত হয়েছিল ব'লে বেশি গাঢ় মনে হচ্ছে। বড়োসড়ো সংশোধন কখনও করেন নি।'

(চারটি উপন্যাস জীবনানন্দ দাশ, সম্পাদনা ও টীকা ভূমেন্দ্র গুহ সহযোগিতা গৌতম মিত্র, প্রতিক্ষণ ২০০৬)

সন্দীপ নায়ক উপন্যাসটি প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের আবহমান পাঠককে ঋণী করলেন। কবির ১২৫ তম জন্মদিনের মুহূর্তে এর থেকে বড়ো উপহার আর কি হতে পারে।

১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ গৌতম মিত্র